শ্রীচৈতন্যের ভক্তিতত্ত্ব প্রসারে কীর্তনের অবদান

নিমাই দাস

দর্শন বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
ndnimaidas202@gmail.com

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাকালের এক ক্ষণিক অথচ সুদুর্লভ বিষয় বা ঘটনা যাই বলা হোক না কেন তা হল মনুষ্যজন্ম। এই মনুষ্যজন্ম লাভ করে কি আমরা শুধু এই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু তথা নানা দুঃখ ও কষ্টই ভোগ করব। আর পরিশেষে আগাছার মত মৃত্যুবরণ করব? মনুষ্যজন্মের কি কোন উদ্দেশ্য নেই? এমন বিভিন্ন সব প্রশ্ন অহরহ আমাদের মনে সব সময়ই অনবরত উত্থাপন হয় আবার আমাদেরই অহং এর বিড়ম্বনায় তা সময়ের আলো আঁধারে হারিয়ে যায়। এই সকল প্রশ্ন ও পরিস্থিতির উর্ধে একটি জিজ্ঞাস্য আমাদের মনে আসে সেটি হল "এই জগতে প্রকৃত সত্য কি"? কেননা পার্থিব জগতে অস্তিত্ববান ও প্রত্যক্ষগোচর সকল কিছুই ক্ষণিক ও আপেক্ষিক। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে "মৃত্যুই" একমাত্র সত্য। এই মৃত্যুকে আমরা কি জয় করতে পারবো অর্থাৎ সুখ-দুঃখ মিশ্রিত এই জীবন থেকে কি মুক্তি পাবো? আর যদি পাই বা পেতে চাই তাহলে কিভাবে সম্ভব, এমন সব প্রশ্নও উত্থাপিত হয়। সাধারণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতীয় দর্শনে মুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়মার্গ প্রভৃতি, যদিও তা অতি প্রাচীন। কিন্তু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব এক নতুন পথের সন্ধান দেন যেখানে তিনি জ্ঞান ও কর্মের সাথে ভক্তির এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ দেখান, যাকে আমরা জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি মার্গ বলি। ভাষা ছাড়া যেমন মানুষের সাথে মানুষের ভাবের আদান প্রদান হয় না, ঠিক তেমনি এই নতুন পথ সাধারণ মানুষের কাছে তিনি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন ও পরিবেশন করেন। যেমন, স্বামীবিবেকানন্দ তিনি তাঁর ব্যবহারিক বেদান্তে বলেন যে "আমি শুষ্ক সুকঠিন বেদান্তের বা অদ্বৈত বেদান্তের যুক্তিকে প্রেমের মধুরতম রসে কোমল করে তীব্র কর্মের মশলায় সুস্বাদু করে এবং যোগের পাকশালায় রান্নাকরে পরিবেশন করতে চাই, যাতে শিশুরা পর্যন্ত তা হজম করতে পারে"।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক বাংলা তথা ভারতবর্ষ তখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তার উপর বাংলার সেন বংশের কৌলীন্য প্রথা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অতীষ্ট করে তুলেছিল। এছাড়াও তারা সরাসরি কোন ধর্মীয় আচরণে অংশ গ্রহণ তথা কোন পূজার্চনা করতে পারত না। ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে বহু দিন ধরে। আবার সেই সময়ে মুসলিম শাসকবর্গের উৎপীড়ন ও মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরীকরণ হিন্দু জাতীয় জীবনকে এক অবক্ষয়ের সামনে এনে উপস্থিত করে। কেননা তখন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচারে অনেকেই মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই রকম এক সামাজিক অবক্ষয়ের পরিস্থিতিতে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন।

চৈতন্যদেব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই জাতীয় বিপর্যয়কে রোধ করতে হলে এক সহজ সরল পথ আবিষ্কার করতে হবে নাহলে অবহেলিত, পীড়িত নিম্ন বর্ণের মানুষগুলিকে ধর্মান্তরীকরণের হাত থেকে ফেরানো যাবে না এবং নতুন করে অবশিষ্ট মানুষগুলি যাতে সেই ধর্মান্তরীকরণের পথে অগ্রসর না হয় সেদিকেও তাঁর সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ছিল। তাই তিনি ভগবৎ প্রেম বা ভক্তির পথকেই বেছে নিলেন সাধারণ মানুষের হিত তথা মুক্তির জন্য। কিন্তু এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে এই ভক্তি বা প্রেম সর্ব সাধারণের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়? শ্রীচৈতন্যদেব এক অভিনব পথের উদ্ভাবন করেন যা পরবর্তী সময়ে শুধু ভারতীয় জনজীবনে নয় সারা বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও বন্দিত হয়। সেই পথ হল কীর্তনের পথ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন

কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন।।
তাহা প্রবর্তাইলা তুমি এই ত 'প্রমাণ"।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি — ইথে নাহি আন।।[১]

"কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন। কৃষ্ণশক্তি ছাড়া তা প্রবর্তন করা কখনই সম্ভব হত না। আপনি তা প্রবর্তন করেছেন, তার ফলে প্রমাণিত হয় যে, আপনি কৃষ্ণশক্তি ধারণ করেনত্ত সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।"

'কৃৎ' ধাতুর অর্থ প্রশংসা। 'কীর্তি' ও 'কীর্তন' এই উভয় শব্দই 'কৃৎ" ধাতু থেকে এসেছে। জীব গোস্বামী বহুজনের সম্মিলিত গানকে সংকীর্তন বলেছেন

"সঙ্কীর্তন বহুভিমিলিত্বা কৃষ্ণগান সুখম্"।[২]

'কীর্তন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল প্রশংসা, বন্দনা, স্তুতিগান, যশঃকীর্তন, নামগান, নামকীর্তন, উপাসনার অঙ্গ ইত্যাদি। বাচস্পত্য অভিধানের সংজ্ঞানুসারে 'কীর্তি" অর্থে খ্যাতি, মহিমা ও যশোসূচক গানকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুকুমার সেনের মতে, 'কীর্তন" মানে 'ভগবানের কীর্তি-গান"।[৩]

এই সম্পর্কে শ্রীমধ্বাচার্যের নারায়ণ-সংহিতার একটি শ্লোকের কথা মনে পরে যায়

দ্বাপরীয়ৈজনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্ত কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।[৪]

"দ্বাপরযুগে মানুষ কেবল পাঞ্চরাত্রিকী বিধি অনুসারে ঐশ্বর্যের সাথে পূজা করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করতে পারতেন, কিন্তু কলিযুগে কেবল তাঁর নাম গ্রহণ করার মাধ্যমে ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা যায়।" শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা ছড়া কেউ সারা জগতের গুরু হতে পারেন না'।[৫]

শ্রীচৈতন্যের আচরিত ও প্রচারিত এই নব প্রেম ধর্মের বাণী এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি যে এক নতুন জীবন আদর্শ লাভ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। পবিত্র প্রেমের সাধক ও ভক্তরূপে কৃষ্ণ নামে বিভোর হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির উদ্ধার কাজে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন বললে হয় তো ভুল কিছু বলা হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবের গৃহীত এই কীর্তন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল; কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্র, কৃচ্ছতাসাধন, শাস্ত্রপাঠ কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। যখন যেখানে খুশি সেখানে তেমনিভাবে,

যে কেউ মুচি, মেথর, শূদ্র, নিরক্ষর মানুষও কীর্তনের মাধ্যমে প্রেম বিতরণ করতে পারেন। কীর্তনের কোন স্থান কাল পাত্র ভেদ নেই। কালক্রমে এই কীর্তন সঙ্গীতরূপ নেয়।

কীর্তন সঙ্গীত শ্রেণীভুক্ত হলেও কীর্তনের বিষয়ভিত্তিক বা প্রয়োগভিত্তিক রূপে 'নয়' (৯) ধরনের প্রয়োগ পদ্ধতির প্রচলন পাওয়া যায়। যথা বন্দনা কীর্তন, প্রার্থনা কীর্তন, আরতি কীর্তন, অধিবাস কীর্তন, পরবগান, সূচককীর্তন, নাম কীর্তন, ও পদাবলী কীর্তন এবং লীলা বা পালা কীর্তন। এই নানাবিধ কীর্তনের মধ্যে পদাবলী কীর্তন ও লীলা কীর্তনের প্রচলন বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং বর্তমানেও লীলা কীর্তন সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের সময়ে নাম কীর্তনের প্রচলন ছাড়াও ভজন প্রণালী, প্রার্থনা, বন্দনা, আরতি ও অধিবাস সূচক ও পরব কীর্তন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।[৬]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণ ও মতে নামকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। বত্রিশ (৩২) অক্ষরে গঠিত নামকে মহামন্ত্র বলা হয়। হরিনাম মহামন্ত্রে তিনটি নামের (হরে, কৃষ্ণ, এবং রাম) ষোলবার (১৬) আবৃত্তি আছে, যা বর্তমানে বিশ্ববন্দিত—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে"।।[৭]

শ্রীচৈতন্যদেবের এই সুমধুর প্রেমের বাণীতে সকলেই নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন এবং তিনি তাঁর ভক্তদের উদ্দেশে বলেছেন, যে বা যারা কৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কে এখনও অজ্ঞাত, ভক্তবৃন্দগণ যেন তাদের পথ দেখান ও হরি নামে অংশ গ্রহণের কথা বলেন। সেই কারণ বশতঃ আমরা দেখতে পাই যে, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ও কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন ও ভক্তের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ), উড়িষ্যার পুরী, দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন, নামক প্রভৃতি স্থান এবং ভক্তদের মাধ্যমেও প্রেম ধর্ম প্রচার বৃদ্ধি পায়। তাঁর বহুধা ভক্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী, নিত্যানন্দ, ঈশ্বরপুরী, মাধবেন্দ্র পুরী, যবন হরিদাস, রায় রামানন্দ প্রমুখ। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন-

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন।।

তাঁর প্রচারিত এই প্রেম ধর্মের মাধ্যমে যে সংকীর্তন, পরবর্তীকালে সেই কীর্তনে হরিনাম বা কৃষ্ণ নামের পরিবর্তে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নাম অবলম্বনে নাম গান করার রীতিও দেখা যায়, যা আজও বর্তমান। যেমন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধা গোবিন্দ"।।[৯]

অথবা

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে"।।

চার্বাক ছাড়া সকল ভারতীয় দর্শনে মানুষের পরম পুরুষার্থ হিসাবে মোক্ষকে স্বীকার করা হয়। এই মোক্ষ লাভের বিভিন্ন রকম পথের কথা বলা হয়, যথাত্ত জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ, ভক্তি মার্গ, জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় মার্গ ইত্যাদি। যে মার্গই অনুসরণ করা হোক না কেন, একই ঈশ্বরের সান্নিধ্যই তারা লাভ করেন বলা যায়। মানুষকে এই ঈশ্বর বা ব্রহ্মের এই প্রকাশ রূপেও দেখা হয়। মানুষ হল ঈশ্বরেরই এই সন্তান। একই ঈশ্বরের বহু প্রকাশ। বেদান্ত দর্শনে আভাসবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ দিয়ে জীব এবং ব্রহ্মের একত্ম প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানুষে মানুষে আমাদের যে ভেদ তা হল ব্যবহারিক। পারমার্থিক দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই সব মানুষই সমান। অজ্ঞানতা বশতঃ মায়ার প্রভাবে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র 'আমির' বশবর্তী হয়ে হাজার ভেদের প্রাচীর তুলি। গুণ কর্মের বিভাগকে ভুলে গিয়ে, জন্মগত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় বিভেদের প্রাচীর তুলে হিংসা ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমতত্ত্ব আমাদের এই উপলব্ধি করায় যে, সকল মানুষই বা সকল জীবই কৃষ্ণ সৃষ্ট। কাজেই কেউ ছোট বা কেউ বড় নয়। এমনকি মানুষ, অন্যান্য জীব, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ থেকেও উন্নততর নয়। সর্বমানবে, সর্ব জীবে, সর্ব ভূতে সেই এক শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণতত্ত্ব লীলা বিরাজমান।

এই কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব যে কীর্তনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তা আজও বর্তমান। এই একবিংশ শতাব্দীতেও বিরাজমান। আজও বাংলা তথা সমগ্র ভারত বললেও ভুল হবে, সমগ্র বিশ্ব দরবারে এই নামসংকীর্তনের প্রভাব দেখা যায়। এই প্রেমতত্ত্বের পথ আজ দেশ-বিদেশ সকলেই গ্রহণ করছেন। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক নদীয়ার শ্রীধাম মায়াপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠা (ইস্কন)। যার শাখা এখন সারা বিশ্বে গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব আমরা যদি গভীরভাবে অনুধাবন করি, তাহলে উপলব্ধি করতে পারব যে, হিংসার পরিবর্তে হিংসা নয়, ঘৃণার পরিবর্তে ঘৃণা নয়, বরং অহিংসা, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসাই হল মানব মিলনের তথা বিশ্বশান্তির মহামন্ত্র।

বর্তমান সময়ে এই বক্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হবে মোর নাম।।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যলীলা ৭ / ১১-১২)

২. সেন সরকার, মঞ্জুবাণী, চৈতন্য দেবের প্রেম ধর্ম ও নবজাগরণ, কলকাতা ৯, করুণা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ২২

৩. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা, নবদ্বীপ ৭৪১৩০২, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ১১

৪. গোস্বামী, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (অন্ত্যলীলা), অনু শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, শ্রীমায়াপুর, ভক্তিভেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০১৬, পৃ. ৩৮২

৫. তদেব, পৃ. ৩৮২

৬. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা, নবদ্বীপ ৭৪১৩০২, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, সেপ্টেম্বর

২০১৫, পৃ. ১৭

৭. তদেব, পৃ. ১৯

৮. গোস্বামী, শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (আদিলীলা), অনু শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ, শ্রীমায়াপুর, ভক্তিভেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০১৬, পৃ. ৪৬৮

৯. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা, নবদ্বীপ ৭৪১৩০২, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, সেপ্টেম্বর

২০১৫, পৃ. ২২

১০. তদেব, পৃ. ২২